أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/N) www.motaher21.net

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

পূর্ব পশ্চিম মহান আল্লাহ্‌রই।

To Allah belong the  east and the west.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১১৫

وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ ۟ فَاَیْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِیْمٌ

পূর্ব ও পশ্চিম সব আল্লাহর। তোমরা যেদিকে মুখ ফিরাবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান। আল্লাহ বড়ই ব্যাপকতার অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জ্ঞাত।

১১৫ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইবনু কাসীর, তাবারী, কুরতুবীতে এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে একাধিক বর্ণনা বিদ্যমান।

সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বর্ণনা হল- ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করে বাহনের ওপর নফল সালাত আদায় করছিলেন। আর বাহন তখন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিকে মুখ ঘুরে চলছিল। অতঃপর ইবনু উমার (রাঃ)

(وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ....)

অত্র আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন এ ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। (সহীহ মুসলিম হা: ১৬৪৪-৪৫, ১৬৫০)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা পূর্ব ও পশ্চিম দু’ দিককে নির্দিষ্ট করে উল্লখ করেছেন যা উদয় ও অস্তাচল। তিনি এ দু’ দিকসহ সকল দিকের মালিক। অতএব সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে যেদিকেই তোমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয় সেদিকেই আল্লাহ তা ‘আলা রয়েছেন। তাতে তোমরা আল্লাহ তা ‘আলার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবে না। তাই কেউ যদি আদিষ্ট কেবলা অনুসন্ধান করে না পায়, তাহলে তার কাছে যেটা কেবলার দিক বলে মনে হবে সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করবে, তারপর যদি জানা যায় কেবলা নির্ণয়ে ভুল হয়েছে তাহলে সালাত পুনরায় আদায়ের প্রয়োজন নেই।

(فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ)

‘সে দিকেই আল্লাহর চেহারা রয়েছে’ আয়াতের এ অংশ প্রমাণ করছে আল্লাহ তা ‘আলার চেহারা রয়েছে। তাঁর জন্য যেমন উপযোগী তেমন তাঁর চেহারা, কোন কিছুর সাথে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য নেই। অন্যত্র তিনি বলেন:

(وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ )

“এবং অবশিষ্ট থাকবে শুধু তোমার প্রতিপালকের চেহারা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।”

সুতরাং আমাদের ঈমান রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা ‘আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তা ‘আলার জন্য যে সকল নাম ও সিফাত উল্লেখ করেছেন তা সত্য। তাঁর সিফাতের সাথে মাখলুকের সিফাতের কোন সাদৃশ্য নেই। তাই আমরা শাব্দিক ও আর্থিক কোন প্রকার পরিবর্তন করব না। বরং যেভাবে কুরআন ও সুন্নাহয় এসেছে সেভাবেই বিশ্বাস করব।

অর্থাৎ আল্লাহ পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। তিনি সকল দিকের ও সকল স্থানের মালিক। কিন্তু নিজে কোন স্থানের পরিসরে সীমাবদ্ধ নেই। কাজেই তাঁর ইবাদাতের জন্য কোন দিক বা স্থান নির্দিষ্ট করার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ সেদিকে বা সে স্থানে থাকেন। কাজেই ইতিপূর্বে তোমরা ওখানে বা ঐ দিকে ফিরে ইবাদাত করতে আর এখন সেই জায়গা বা দিক পরিবর্তন করলে কেন –একথা নিয়ে ঝগড়া বা বিতর্ক করার কোন অবকাশ নেই।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ সীমাবদ্ধ নন। তিনি সংকীর্ণ মন, সংকীর্ণ দৃষ্টি ও সংকীর্ণ হাতের অধিকারী নন। অথচ তোমরা আল্লাহকে তোমাদের মতো ভেবে এ রকম মনে করে রেখেছো। বরং তাঁর খোদায়ী কর্তৃত্ব বিশাল-বিস্তৃত এবং তাঁর দৃষ্টিকোণ ও অনুগ্রহ দানের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। তাঁর কোন্ বান্দা কোথায় কোন্ সময় কি উদ্দেশ্যে তাঁকে স্মরণ করছে---একথাও তিনি জানেন।

(وَجْهُ الله) শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র চেহারা। মুসলিমদের আকীদা বিশ্বাস হলো এই যে, আল্লাহ্‌র চেহারা রয়েছে। তবে তা সৃষ্টির কারও চেহারার মত নহে। কিন্তু এ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো - সকল দিকই যেহেতু আল্লাহ্‌র সুতরাং মুসল্লী পূর্ব ও পশ্চিম যেদিকেই মুখ ফিরাক না কেন। সেদিকেই আল্লাহ্‌র কিবলা রয়েছে। কেউ কেউ এ আয়াতটিকে আল্লাহ্ তা'আলার সিফাত মুখমণ্ডল বা চেহারা সাব্যস্ত করার জন্য দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন। মূলতঃ এ আয়াতটিতে ওয়াজহ' শব্দটি দিক বা কেবলা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তাই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতটিকে সিফাতের আয়াতের মধ্যে গণ্য করাকে ভুল আখ্যায়িত করেছেন। [দেখুন - মাজমু ফাতাওয়াঃ ২/৪২৯, ৩/১৯৩, ৬/১৫-১৬]

কোন কোন মুফাসসির (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا وَجْهُ اللهِ) আয়াতকে এই নফল সালাতেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল সালাতেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে সালাতরত অবস্থায় রেলগাড়ী অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ না থাকলে সে অবস্থায়ই সালাত পূর্ণ করবে। এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে সালাত আদায়কারীর জানা না থাকলে, রাতের অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেয়ার লোক না থাকলে সেখানেও সালাত আদায়কারী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে [ তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ]

এখানে কেবলামুখী হওয়ার সম্পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য (নাউযুবিল্লাহ) বায়তুল্লাহ অথবা বায়তুল- মুকাদ্দাসের পূজা করা নয়। সমস্ত সৃষ্টিজগত তাঁর কাছে অতি ছোট। এরপরও বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ্‌র দুটি গুরুত্বপূর্ণ গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছে, তিনি (وَاسِعٌ) এ শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে। এক. প্রাচুর্যময়; অর্থাৎ তাঁর দান অপরিসীম। তিনি যাকে ইচ্ছা তার কর্মকাণ্ড দেখে বিনা হিসেবে

দান করবেন। পূর্ব বা পশ্চিম তাঁর কাছে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তিনি দেখতে চাইছেন যে, কে তার কথা শুনে আর কে শুনে না। দুই. (وَاسِعٌ) শব্দটির দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, সর্বব্যাপী। অর্থাৎ তিনি যেহেতু সবদিক ও সবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ খবর রাখেন সুতরাং তাঁর জন্য কোন কাজটি করা হল সেটা তিনি ভাল করেই জানেন। সে অনুসারে তিনি তাঁর বান্দাকে পুরস্কৃত করবেন। এ অর্থের সাথে পরে উল্লেখিত দ্বিতীয় গুণবাচক নাম (عَلِيْمٌ) শব্দটি বেশী উপযুক্ত।

## কিবলার নির্ধারণ

অত্র আয়াতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এবং তাঁর সাহাবীবর্গকে সান্ত্বনা দেয়া হচ্ছে, যাঁদেরকে মাক্কা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে ও তাঁর মসজিদে প্রবেশ করা হতে বিরত রাখা হয়েছে। মাক্কায় অবস্থান কালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। তখন কা ‘বা ঘর তাদের মাঝখানে থাকতো। মদীনায় আগমনের পর ১৬/১৭ মাস পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করেই তাঁরা সালাত আদায় করেন। কিন্তু পরে মহান আল্লাহ কা ‘বা ঘরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন। এরপর এই আয়াতটি নাযিল হয়।

## কুর’ আন মাজীদে সর্বপ্রথম রহিতকৃত বা মানসূখের হুকুম

ইমাম আবূ আবীদ কাসীম ইবনে সালাম (রাঃ) স্বীয় পুস্তক ‘নাসিখ ওয়াল মানসূখ’ এর মধ্যে ‘আবদুল্লাহ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কুর’ আন মাজীদের মধ্যে সর্বপ্রথম মানসূখ হুকুম হচ্ছে এই কিবলাই অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াতটিই। এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে থাকেন। অতঃপর নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয়ঃ

﴿وَ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾

‘আর তুমি যেখান হতেই বের হবে, তোমার মুখ পবিত্রতম মসজিদের দিকে প্রত্যাবর্তন করো। (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৪৯) তখন তিনি বায়তুল্লার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে শুরু করেন। মাদীনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে থাকলে ইয়াহুদীরা খুবই খুশি হয়। যা হোক, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মনের একান্ত ইচ্ছা ছিলো ইব্রাহীম (আঃ) এর কিবলাহ তথা কা ‘বা ঘরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা। এ জন্য তিনি মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাতেন এবং মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেন। তখন মহান আল্লাহ নাযিল করেন, ‘নিশ্চয়ই আমি আকাশের দিকে তোমার মুখমণ্ডল উত্তোলন অবলোকন করেছি।’ (২ নং সূরা বাকারাহ, আয়াত নং ১৪৪) যখন এই হুকুম মানসূখ হয়ে যায় এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা অনুযায়ী বায়তুল্লার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার জন্য আদিষ্ট হোন তখন ঐ ইয়াহুদীরাই তাঁকে বিদ্রূপ করে বলতে থাকে যে, কিবলাহ পরিবর্তিত হলো কেন? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ

ইয়াহুদীদেরকে যেন বলা হচ্ছে যে, এ প্রতিবাদ কেন? যে দিকে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ হবে সে দিকেই ফিরে যেতে হবে। কারণ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে ইকরামা (রহঃ) বর্ণনা করেনঃ ‘তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাও সেই দিকেই মহান আল্লাহ্‌র মুখমণ্ডল রয়েছে’ এর অর্থ হলো মহান আল্লাহ্‌র অবস্থান পূর্ব ও পশ্চিম সর্ব জায়গায়ই রয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হলো তুমি যে দিকেই থাকো না কেন, তুমি কিবলাহ তথা কা ‘বার দিকে মুখ ফিরাও। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৪৫) অত্র বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর ইবনে আবি হাতিম বলেন, যে কিবলাহ পরিবর্তন এর বিষয়টি ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে ‘আতা, আবুল ‘আলিয়া, হাসান বাসরী, ‘আতাউল খুরাসানী ‘ইকরামা, কাতাদাহ, সুদ্দী এবং যায়দ ইবনে আসলাম (রহঃ) ও বর্ণনা করেছেন যে এর অর্থ হচ্ছে ‘পূর্ব ও পশ্চিম যেখানেই থাকো না কেন, কা ‘বার দিকে মুখ করো।’

ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন যে, কয়েকজন মনীষী থেকে বর্ণনা আছে যে, এ আয়াতটি কা ‘বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছিলো এবং এর ভাবার্থ এই যে, পূর্ব ও পশ্চিম যে দিকেই চাও মুখ ফিরিয়ে নাও, যখন সফরে থাকো অথবা ভয়ে কিংবা যুদ্ধ অবস্থায় থাকো, সব দিকই মহান আল্লাহ্‌র এবং সব দিকেই তিনি বিদ্যমান রয়েছেন। (তাফসীর তাবারী ২/৫৩০) মহান আল্লাহ হতে কোন জায়গা শূন্য নেই। যেমন তিনি বলেনঃ

﴿وَ لَاۤ اَدۡنٰی مِنۡ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكۡثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمۡ اَیۡنَ مَا كَانُوۡا﴾

‘তারা এ তদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন।’ (৫৮ নং সূরা মুজাদালাহ, আয়াত নং ৭)

যানবাহনে বা সফরে থাকাবস্থায় কিবলার বিধান

ইবনে ‘উমার (রাঃ)-এর উষ্ট্রীর মুখ যে দিকেই থাকতো তিনি সেই দিকেই ফিরে সালাত আদায় করে নিতেন এবং বলতেনঃ ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপই করতেন এবং তাঁর নিকট এটাই ছিলো ﴿فَاَیۡنَمَا تُوَلُّوۡا فَثَمَّ وَجۡهُ اللّٰهِ﴾ এ আয়াতের ভাবার্থ। (হাদীসটি সহীহ। তাফসীর তাবারী ২/৫৩০/হা ১৮৩৯। সহীহ মুসলিম ১/৩৩/৪৮৬, সুনান তিরমিযী ৫/২৯৫৮, সুনান নাসাঈ ১/২৬৪/হা ৪৯০) আয়াতের উল্লেখ ছাড়াও এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম, জামি ‘উত তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, মুসনাদ ইবনে আবি হাতিম, মুসতাদারাক হাকিম ইত্যাদি কিতাবেও বর্ণিত আছে। (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ২/১০৯৭, ১০৯৮, সহীহ মুসলিম ১/৩৯/৪৮৭, ১/৪০/৪৮৮) সহীহুল বুখারীতে রয়েছে যে, ইবনে ‘উমার (রাঃ) কে যখন ভয়ের সময়ের সালাত আদায় করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হতো তখন ভয়ের সালাতের বর্ণনা করতেন এবং বলতেনঃ ‘এর চেয়েও বেশি ভয় হলে পায়ে চলা অবস্থায় এবং আরোহণের অবস্থায় দাঁড়িয়ে বা বসে সালাত আদায় করে নিয়ো, মুখ কিবলার দিকে হোক, আর নাই হোক।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ৮/৩৫৩৫, ফাতহুল বারী ৮/৪৬)

ইমাম শাফি ‘ঈ (রহঃ) ও ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর মতে সফরে সাওয়ারীর ওপর নফল সালাত আদায় করা বৈধ। সেই সফর নিরাপদের হোক বা ভীতি পূর্ণ হোক বা যুদ্ধেরই হোক না কেন। কিন্তু ইমাম মালিক (রহঃ)-এর বিপরীতে অভিমত দিয়েছেন। ইমাম আবূ ইঊসুফ এবং আবূ সা ‘ঈদ ইসতাখারী (রহঃ) সফর ছাড়া অন্য সময়েও নফল সালাত সাওয়ারীর ওপর পড়া বৈধ। কোন কোন মুফাসসিরগনের মতে অত্র আয়াতটি ঐ সব লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে যারা কিবলা সম্পর্কে অবহিত ছিলো না। ফলে তারা নিজ নিজ ইজতিহাদ অনুপাতে বিভিন্ন জন বিভিন্ন দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছিলো। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের সালাতকে সিদ্ধ বলা হয়েছে।

এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, অন্ধকার রাতে কিংবা আকাশ যখন মেঘে ঢাকা থাকে এবং কিবলার দিক নির্ণয় করা সম্ভব হয় না সেই সময়ের জন্য এ আয়াতটি প্রযোজ্য। তখন ভুল করে কিবলার পরিবর্তে যে দিক ফিরেই সালাত আদায় করা হোক না কেন সালাত আদায় করা হয়ে যাবে।

মদীনাবাসীদের কিবলাহ হলো পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে

তাফসীর ইবনে মিরদুওয়াইয়ের একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ‘মাদীনা, সিরিয়া এবং ‘ইরাকবাসীদের কিবলাহ হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান। এ বর্ণনাটি জামি ‘উত তিরমিযীতেও অন্য শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। (হাদীসটি মুনকার। আল ‘উকাইলি ৪/৩০৯, জামি ‘ তিরমিযী ২/১৭১/৩৪২, ইবনে মাজাহ, ১/৩২৩/হা ১০১১, সুনান নাসাঈ ৪/১৭২)

ইবনে ‘উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যখন তুমি পশ্চিমকে তোমার ডান দিকে ও পূর্বকে বাম দিকে করবে, তখন তোমার সামনের দিকেই কিবলাহ হয়ে যাবে। এটাও বর্ণিত আছে যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান হচ্ছে কিবলাহ।

ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন যে, ﴿إِنَّ اللهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾ এ আয়াতের ভাবার্থ এটাও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ যেন বলছেনঃ ‘প্রার্থনা জানানোর সময় তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল যে দিকেই করবে সে দিকেই আমাকে পাবে এবং আমি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করবো।’

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, তিনি পরিবেষ্টনকারী ও পূর্ণ জ্ঞানবান, যাঁর দান, দয়া এবং অনুগ্রহ সমস্ত সৃষ্টজীবকে ঘিরে রেখেছে, তিনি সমস্ত কিছু জানেন বটে। কোন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম জিনিসও তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই।’ (তাফসীর তাবারী ২/৫৩৭)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. পূর্ব-পশ্চিমসহ সারা জাহানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা ‘আলা।

২. আরোহী অবস্থায় নফল সালাত আদায় করা যাবে, তাতে কেবলামুখী না হতে পারলে সমস্যা নেই। তবে ফরয সালাত কেবলামুখী হয়ে আদায় করা আবশ্যক।

৩. আল্লাহ তা ‘আলার চেহারা রয়েছে, কোন ধরণ-গঠন জিজ্ঞাসা এবং বিকৃতি ও অস্বীকৃতি ছাড়াই এর ওপর ঈমান আনব।

১১৬ নং আয়াতে

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًاۗ سُبْحٰنَهُۥۖ بَل لَّهُۥ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِۖ كُلٌّ لَّهُۥ قٰنِتُونَ

তারা বলে যে, মহান আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি অতি পবিত্র, বরং যা কিছু আকাশসমূহে এবং ভূমণ্ডলে আছে সবই তাঁর, সকলই তাঁর অনুগত।

১১৭ নং আয়াতে

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِۖ وَإِذَا قَضٰىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

তিনি আসমানসমূহ ও যমীনের উদ্ভাবক। আর যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার জন্য শুধু বলেন, ‘হও’ , ফলে তা হয়ে যায়।

১১৬ ও ১১৭ নং আয়াতের তাসফীর:

নাসারারা বলে থাকে আল্লাহ্ রাববুল আলামীন সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ এটা সম্পূর্ণ একটি অপবাদ। কুরআনের অন্যত্র এসেছে, তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের শোভন নয়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের কাছে বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। [সূরা মারইয়ামঃ ৯১-৯৩]

এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ বলেন, মানুষ আমার উপর মিথ্যারোপ করে, অথচ তাদের এটা উচিত নয়। মানুষ আমাকে গালি দেয়, অথচ তাও তাদের জন্য উচিত নয়। মিথ্যারোপ করার অর্থ হলো, তারা বলে, আমি তাদের মৃত্যুর পর জীবিত করে পূর্বের ন্যায় করতে সক্ষম নই। আর গালি দেয়ার অর্থ হলো, তারা বলে যে, আমার পুত্র আছে। অথচ স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করা থেকে আমি পবিত্র। " [বুখারীঃ ৪৪৮২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, “কষ্টদায়ক কথা শুনার পর আল্লাহ্‌র চেয়ে বেশী ধৈর্যশীল আর কেউ নেই, মানুষ তাঁর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে, তারপরও তিনি তাদেরকে নিরাপদে রাখেন ও রিফিক দেন। " [বুখারী: ৭৩৭৮, মুসলিম: ২৮০৪]

‘মহান আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি রয়েছে’ এ দাবীর খণ্ডন

অত্র আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতগুলো দ্বারা খ্রিষ্টান, ইয়াহুদী ও মুশরিকদের কথাকে বাতিল বলে প্রত্যখ্যান করা হয়েছে, যারা মহান আল্লাহ্‌র সন্তান সাব্যস্ত করেছিলো। তাদের সবাইকে মহান আল্লাহ মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদি সমুদয়ের তিনি মালিক তো বটেই, এগুলোর সৃষ্টিকর্তা, আহার দাতা, তাদের ভাগ্য নির্ধারণকারী, তাদেরকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আনয়নকারী, তাদের মধ্যে পরিবর্তনকারীও একমাত্র তিনিই। তাহলে তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সন্তান কিরূপে হতে পারে? ‘ঈসা (আঃ) মহান আল্লাহ্‌র পুত্র হতে পারেন না, যেমন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা ধারণা করতো। ফেরেশতারাও মহান আল্লাহ্‌র কন্যা হতে পারেন না, যেমন ‘আরবের মুশরিকরা মনে করতো। কেননা পরস্পর সমান সম্বন্ধযুক্ত দু’ টি বস্তু থেকে সন্তান হতে পারে; কিন্তু মহান আল্লাহ তো তুলনাবিহীন। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই। তিনিই তো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সুতরাং তাঁর সন্তান হবে কি রূপে? তাঁর কোন সহধর্মিনীও নেই। তিনি বলেনঃ

﴿بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ اَنّٰی یَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ ؕ وَ خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ ۚ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ﴾

‘তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর জীবন সঙ্গিনীই কেউ নেই। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তাঁর ভালো রূপে জ্ঞান রয়েছে। (৬ নং সূরা আন ‘আম, আয়াত নং ১০১) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًاؕ ﴿۸۸﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْـًٔا اِدًّاۙ ﴿۸۹﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّاۙ ﴿۹۰﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًاۚ ﴿۹۱﴾ وَ مَا یَنْۢبَغِیْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ یَّتَّخِذَ وَلَدًاؕ ﴿۹۲﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّاۤ اٰتِی الرَّحْمٰنِ عَبْدًاؕ ﴿۹۳﴾ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّاؕ ﴿۹۴﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِیْهِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ فَرْدًا﴾

তারা বলেঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা তো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছো। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ড বিখণ্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের ওপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (১৯ নং সূরা মারইয়াম, আয়াত নং ৮৮-৯৫) সুতরাং দাস সন্তান হতে পারে না। মনিব ও সন্তান এ দু' টি বিপরীতমুখী ও পরস্পর বিরোধী। অন্য স্থানে একটি পূর্ণ সূরায় মহান আল্লাহ একে নাকচ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেনঃ

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ۬ وَ لَمْ يُوْلَدْۙ ﴿۳﴾ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ﴾

বলোঃ তিনি মহান আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। মহান আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। (১১২ নং সূরা ইখলাস, আয়াত নং ১-৪) এই আয়াতসমূহে এবং এরকম আরো বহু আয়াতে সেই বিশ্বপ্রভু স্বীয় পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন, তিনি যে তুলনাহীন ও নযীরবিহীন এবং অংশীদারবিহীন তা সাব্যস্ত করেছেন। আর মুশরিকদের এ জঘন্য বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি তো সবারই সৃষ্টিকর্তা ও সবারই প্রভু। সুতরাং তাঁর সন্তান-সন্ততি ও ছেলে-মেয়ে হবে কিভাবে?

সূরা বাক্বারার এ আয়াতের তাফসীরে সহীহুল বুখারীর একটি হাদীসে কুদুসীতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে ইবনে 'আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ বলেনঃ

كَذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إيَّاي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله :لي ولد .فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا"

'আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করে, অথচ এটা তাদের জন্য উচিত ছিলো না, তারা আমাকে গালি দেয়, তাদের জন্য এটা শোভনীয় ছিলো না। তাদের মিথ্যা প্রতিপাদন তো এটাই যে, তাদের ধারণায় আমি তাদেরকে মেরে ফেলার পর পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম নই এবং তাদের গালি দেয়া এই যে, তারা আমার সন্তান গ্রহণ করা সাব্যস্ত করে, অথচ আমার স্ত্রী ও সন্তান হওয়া থেকে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র ও তা হতে বহু উর্ধ্বে।' (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ৮/৪৪৮২, সুনান নাসাঈ ৪/২০৭৭, মুসনাদে আহমাদ ২/৩৫০,৩৫১, ফাতহুল বারী ৮/১৮) এই হাদীসটি অন্য সনদে এবং অন্যান্য কিতাবেও শব্দের বিভিন্নতার সাথে বর্ণিত হয়েছে। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

"لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له ولدا، وهو يرزقهم ويعافيهم"

‘মন্দ কথা শ্রবণ করে বেশি ধৈর্য ধারণকারী মহান আল্লাহ অপেক্ষা আর কেউ নেই। মানুষ তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করছে, অথচ তিনি তাদেরকে আহার্য দিচ্ছেন এবং নিরাপদে রাখছেন।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ১০/৬০৯৯, ফাতহুল বারী ১৩/৩৭২, সহীহ মুসলিম ৪/২১৬০/৪৯)

## সবকিছুই মহান আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ كُلٌّ لَهُ قَانِتُوْنَ ‘প্রত্যেক জিনিসই তাঁর অনুগত’ ইবনে ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন, অনুগত অর্থাৎ তারা সালাত আদায় করে। ‘ইকরামা ও আবু মালিক (রহঃ) বলেন, ‘প্রত্যেক জিনিসই তাঁর অনুগত’ অর্থাৎ তারা ‘ইবাদতের স্বীকৃতি দেয়। সা ‘ঈদ ইবনে যুবাইর (রহঃ) বলেন, তাঁকে খাঁটি অন্তরে মেনে থাকে, কিয়ামাতের দিন সব কিছুই তাঁর সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াবে, দুনিয়ার সবাই তাঁর উপাসনায় রত আছে। যাকে তিনি বলেন ‘এ রকম হও’, ‘এভাবে নির্মিত হও’ তা ঐ রকমই হয়ে যায় এবং ঐভাবেই নির্মিত হয়। এরকমই প্রত্যেকে তাঁর সামনে বিনীত ও বাধ্য। মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ কাফেরদের ইচ্ছা না থাকলেও তাদের ছায়া মহান আল্লাহ্‌র সামনে ঝুঁকেই থাকে। (তাফসীর ইবনে আবি হাতিম ১/৩৪৮) মুজাহিদ (রহঃ) আরো বর্ণনা করেছেন, যা ইবনে জারীর (রহঃ) ও সমর্থন করেছেন যে, আসলে এখানে সবই সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ কুনূত হলো অনুগত হওয়া এবং মহান আল্লাহ্‌র বাধ্য হওয়া। কুনূত দুই ধরনের, আইনগত এবং পূর্ব নির্ধারিত। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَ لِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاٰصَالِ۠ ﴾

মহান আল্লাহ্‌র প্রতি সাজদাবনত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল-সন্ধ্যায়। (১৩ নং সূরা রা ‘দ, আয়াত নং ১৫) একটি হাদীসে আছে যেঃ "كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة"

কুর’আন মাজীদের যেখানেই (قنوت) শব্দ রয়েছে সেখানেই তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আনুগত্য। (মুসনাদে আহমাদ ৩/৭৫, আল মাজমা ‘উয যাওয়ায়েদ ৬/৩২। হাদীসটি য ‘ঈফ। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) যেমন বলেছেন যে, সনদ দুর্বল আর মারফূ ‘ হিসেবে বর্ণনা করলে তা হবে মুনকার)

## পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর কোন নমুনা ছিলো না

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা ‘আলা বলেন, بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ‘মহান আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকারী।’ অর্থাৎ পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীর কোন নমুনা ছিলো না, প্রথম বারই তিনি এই দুই এর সৃষ্টিকর্তা। بِدْعَةٌ এর আর্ভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘নতুন সৃষ্টি করা। হাদীসে রয়েছেঃ

"فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"

‘প্রত্যেক নব-সৃষ্টি হচ্ছে বিদ ‘আত এবং প্রত্যেক বিদ ‘আতই পথভ্রষ্টতা।’ (সহীহ মুসলিম ২/৫৯২) বিদ ‘আত দু’ প্রকার। যথা শারী ‘আতের পরিভাষায় বিদ ‘আত। যেমন উল্লিখিত হাদীসটি। আবার কখনো কখনো بِدْعَةٌ শব্দের প্রয়োগ শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থেই হয়ে থাকে। তখন শরী ‘আতের ‘বিদ ‘আত’ বুঝায়না। ‘উমার (রাঃ) জনগণকে তারাবীহ সালাতে সকলকে এক জামা ‘আতে একত্রিত করে বলেনঃ نعْمَتْ البدعةُ هذه ‘এটা ভালো বিদ ‘আত।’ (হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী ৪/২০১০, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ১/৩/১১৪, ১১৫)

বিদ ‘আত পন্থীদেরকে ‘বিদ ‘আতী’ বলার কারণও এই যে, তারাও মহান আল্লাহ্‌র দ্বীনের মধ্যে ঐ কাজ বা নিয়ম আবিষ্কার করে, যা তার পূর্বের শারী ‘আতের মধ্যে ছিলো না। অনুরূপভাবে কোন নতুন কথা উদ্ভাবনকারীকে ‘আরবের লোকেরা مُبْدِعٌ বলে থাকে।

ইমাম ইবনে জারীর (রহঃ)-এর মতে উপরোক্ত আয়াতের ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহ সন্তান হতে পবিত্র। তিনি আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছুর মালিক। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর একাত্মবাদের সাক্ষ্য বহন করে। সব কিছুই তাঁর অনুগত। সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা, নির্মাতা, স্থাপিত, মূল ও নমুনা ছাড়াই ঐ সবকিছু অস্তিত্বে আনয়নকারী একমাত্র সেই বিশ্বপ্রভু মহান আল্লাহই, স্বয়ং ‘ঈসা (আঃ) ও এর সাক্ষী ও বর্ণনাকারী, যদিও কেউ কেউ তাঁকে মহান আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মনে করে। যে প্রভু এসব জিনিস বিনা মূল্যে ও নমুনায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই ঈসা (আঃ) কে পিতা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। (তাফসীর তাবারী ২/৫৫০) সেই মহান আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তি এতো বেশি যে, তিনি যে জিনিসকে যে প্রকারের সৃষ্টি ও নির্মাণ করতে চান তাকে বলেন- ‘এভাবে হও এবং এরকম হও’ আর তেমনই সাথে সাথেই হয়ে যায়। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেনঃ

﴿ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴾

‘তাঁর ব্যাপারে তো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা পোষণ করেন তখন বলেন ‘হও’ ফলে তা হয়ে যায়।’ (৩৬ নং সূরা ইয়াসীন, আয়াত নং ৮২) অন্য জায়গায় বলেনঃ

﴿اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَآ اَرَدْنٰهُ اَنْ نَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴾

আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি ‘হও’ , ফলে তা হয়ে যায়। (১৬ নং সূরা নাহল, আয়াত নং ৪০) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ ﴿فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴾

আমার আদেশ তো একটি কথায় নিস্পন্ন, চোখের পলকের মতো। (৫৫ নং সূরা আর-রহমান, আয়াত নং ৫০)

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, ‘ঈসা (আঃ) কেও মহান আল্লাহ كُنْ শব্দের দ্বারাই সৃষ্টি করেছেন। এক জায়গায় মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেনঃ

﴿ اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ؕ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴾

‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্‌র নিকট ‘ঈসা (আঃ)-এর দৃষ্টান্ত আদম (আঃ)-এর অনুরূপ; তিনি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বললেন হও ফলতঃ তাতেই হয়ে গেলো।’ (৩ নং সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং ৫৯)

এ আয়াত দ্বারা ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তাদের কথা আল্লাহ তা ‘আলার সন্তান আছে। যেমন অন্যত্র আল্লাহ তা ‘আলা তাদের কথা তুলে ধরেছেন-

(وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ۨابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ ۚ يُضَاهِـُٔوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ)

“ইয়াহূদীগণ বলে, ‘উযায়ের আল্লাহর পুত্র’ , এবং খ্রিস্টানগণ বলে, ‘মাসীহ আল্লাহর পুত্র।’ সেটা তাদের মুখের কথা। পূর্বে যারা কুফরী করেছিল তারা তাদের মতো কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে

ধ্বংস করুন। আর কোন্ দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে!” (সূরা তাওবাহ ৯:৩০)

তিনি আরো বলেন:

(وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ)

“তারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান।” (সূরা নাহ্ল ১৬:৫৭)

আল্লাহ তা ‘আলা সবকিছুর একচ্ছত্র মালিক। তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী ইত্যাদি। সবকিছু তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ তা ‘আলার সমতুল্য কেউ নেই, কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাই কিভাবে তাঁর সন্তান বা স্ত্রী থাকতে পারে?

এদের প্রতিবাদে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

(بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)

“বরং আসমান ও জমিনে যা আছে সবই তাঁর জন্য।” (সূরা বাকারাহ ২:১১৬)

তিনি আরো বলেন:

(وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًاهـ۝اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا)

“আর সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না।” (সূরা মারইয়াম ১৯:৯২-৯৩)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আল্লাহ তা ‘আলা বলেন: আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। অথচ এটা তার উচিত নয়। আদম সন্তান আমাকে গালি দেয়, অথচ তা উচিত নয়। আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হল- তাদের বিশ্বাস তারা যেমন ছিল সেরূপ ফিরিয়ে আনতে আমি সক্ষম নই, আর আমাকে গালি দেয়া হল- তারা বলে আমার সন্তান আছে। আমি পবিত্র কোন স্ত্রী বা সন্তান গ্রহণ করা থেকে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৪৮২)

তাই কেউ আল্লাহ তা ‘আলার সন্তান নয়, স্ত্রী নয় বরং সবাই তাঁর বান্দা, সবাই তাঁর কাছে আনুগত্যশীল, বিনয়ী-নম্র। আল্লাহ তা ‘আলা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। যখন তিনি কোন কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করেন তখন শুধু বলেন: “হয়ে যাও” সাথে সাথে তা হয়ে যায়।

অনুরূপ সূরা ইয়াসীনের ৮২ নং আয়াত, সূরা আল-ইমরানের ৫৯ নং আয়াতেও বলা হয়েছে। ==

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা ‘আলা স্ত্রী-সন্তান গ্রহণ করা থেকে পুত-পবিত্র। তিনি একক, তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই।

২. আল্লাহ তা ‘আলা ছাড়া যা কিছু আছে সবই তাঁর বান্দা ও মাখলুক।

৩. আল্লাহ তা ‘আলার সাথে শরীক নির্ধারণ করা তাঁকে কষ্ট দেয়ার শামিল।

৪. আল্লাহ তা ‘আলা ত ‘আলার মহত্ব ও বড়ত্ব জানলাম। তিনি কোন ফায়সালা করার ইচ্ছা করলে শুধু ‘হও’ বললেই তা হয়ে যায়।